মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

# ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার

# ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

**খায়রুন প্রকাশনী**
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

## গ্রন্থকারের কথা

শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সমস্যা মানব সমাজের এক প্রাচীনতম ও জটিলতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই— এই উদ্দেশ্যে রচিত মতবাদেরও কোন অভাব নাই। কিন্তু কার্যত এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কোন নির্ভুল নীতি আজ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। মানুষ যত চেষ্টাই করিতেছে, সমস্যা ততই তীব্রতর ও জটিল হইয়া উঠিতেছে।

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহাতে মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের মূলনীতি বর্তমান রহিয়াছে। দুনিয়ার সকল মানুষের— বিশেষত মুসলমানদের বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করা একান্তই কর্তব্য।

এই ভূখণ্ডে শ্রমিক-মালিক সমস্যা দীর্ঘকাল হইতেই বিরাজ করিতেছে এবং ক্রমশই উহা জটিলতার হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সুস্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান একমাত্র ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সম্ভব। এই সম্পর্কে ইসলামের সমাধান জনগণের সম্মুখে পেশ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়ায় এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হইল। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে পথের দিকে ইঙ্গিত করাই এই পুস্তিকা লেখার উদ্দেশ্য।

শিক্ষিত সমাজ এই দিকে উৎসাহিত হইলে এবং দেশের মজুর-শ্রমিকগণ ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রমিক সমস্যার সমাধানে যত্নবান হইলেই লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

—গ্রন্থকার

# পূর্বে কথা

শ্রমিক-মালিক সমস্যা মানব সমাজের এক সুপ্রাচীন সমস্যা। যুগ যুগ ধরিয়া এই সমস্যাটি মানব সমাজকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়াছে, অনাকাংক্ষিতভাবে মেহনতী মানুষের রক্ত ঝরাইয়াছে। এমনকি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) নামে একটি বিশ্বসংস্থ্ পর্যন্ত গঠন করা হইয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রমিক-মালিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত হইয়েছে, একথা কোনক্রমেই দাবি করা চলেনা। বরং এখনও দেশে দেশে শ্রমিক-মালিক সমস্যা একটি প্রকট সমস্যা রূপে বিরাজ করিতেছে, শ্রমিজীবি মানুষের রক্তে অহরহ রাজপথ রঞ্জিত হইতেছে।

মূলত শ্রমিক-মালিক সমস্যাটিকে অধুনা বিবেচনা করা হইতেছে নেহায়েত একটি শ্রেণীগত সমস্যা হিসাবে; এখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে না। ফলে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষই বিষয়টিকে বিবেচনা করিতেছে নেহায়েত শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিতে। কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন-বিধান ইসলাম সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনা করিয়াছে মানবিক ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টিতে। শ্রমিক ও মালিক কোন পক্ষকেই সে বড় কিংবা ছোট করিয়া দেখে নাই; বরং উভয় পক্ষের স্বার্থেকেই সে রক্ষা করিয়াছে পরিপূর্ণ ন্যায়পরতার দৃষ্টিতে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) এই বিষয়টিকেই অত্যন্ত চমৎকার রূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার নামক বর্তমান পুস্তিকায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকটি রচিত হইয়াছে দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। তৎকালীন দুনিয়ার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে। তারপর দুনিয়ার উপর দিয়া অনেক পানি গড়াইয়া গিয়াছে; কমিউনিস্ট বিশ্বের মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উপমহাদেশে পাকিস্তান ভাঙিয়া বাংলাদেশ হইয়াছে। ইহার ফলে দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনেও কিছু কিছু পরিবর্তনের ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। এই কারণেই বর্তমান পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশে আমরা কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন বোধ করি নাই।

পুস্তিকার নিবন্ধসমূহ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল পঞ্চাশের দশকের প্রথম ভাগে তৎকালীন দৈনিক আজাদসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং প্রায় একই সময়ে তাতা পুস্তকাকারেও আত্মপ্রকাশ করে। বিগত বৎসরগুলিতে ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পাঠক সমাজেও তাহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পুস্তকটির বর্তমান সংস্করণও পাঠকদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে বলিয়া আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান আল্লাহ পুস্তকটির লেখককে যথোচিত প্রতিফল দান করুন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

চেয়ারম্যান

মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

ঢাকা

১৫ জানুয়ারী, ২০০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# মালিকানা সমস্যা ও ইসলাম

## মালিকানা সম্পর্কে দুইটি মত

অর্থ ও সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। একটি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অপরটি সম্পত্তির জাতীয়করণ। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দান করিয়াছে। যে কোন উপায়ে হউক না কেন, সে যত সম্পদ এবং যত সম্পত্তিই উপার্জন করিবে, তাহাকে সে একান্তভাবে নিজের মালিকানাধীন মনে করিতে পারিবে। উপার্জনের এই নিরংকুশ স্বাধীনতা ব্যয়ের ব্যাপারেও তাহাকে পূর্ণ নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তোলে। কাজেই তাহার উপার্জিত অর্থ ও সম্পত্তি যেভাবে যে পথে এবং যত পরিমাণেই সে ইচ্ছা করিবে, অনায়াসেই তাহা খরচ করিতে পারিবে; কিংবা এক বিন্দু খরচ না করিয়া তিল-তিল করিয়া তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলেও তাহাতে কাহারো আপত্তি করা চলিবে না। এক কথায়, ব্যয় করা বা সঞ্চয় করিবার ব্যাপারে এই মত ব্যক্তিকে পূর্ণ আজাদী দান করিয়াছে। বস্তুত ইহাকেই বলে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার। বর্তমান যুগের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের নিশানবর্দারগণ এই মত সমর্থন করিয়া থাকে। আর সত্য বলিতে কি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির মারাত্মক পরিণতি দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র দুনিয়াকে শোষিত নিষ্পেষিত এবং দুঃখ ও দারিদ্রের দুঃসহ জালায় জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মানুষকে অমানুষিক স্বার্থপরতা ও নির্মম অর্থপূজা শিক্ষা দিয়াছে। এই ব্যবস্থা পুঁজিপতি ও সম্পদশালীদের স্বাতন্ত্র্যবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধে দীক্ষিত করিয়া বিশাল বিশ্ব-মানবতার উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। দুঃখিতের আহাজারী আর ব্যথিতের মর্মবিদারী ফরিয়াদ তাহাদের কর্ণকুহরে মাত্রই পৌছায় না। বিপন্ন ও ব্যথিত মানুষ যখন তাহাদের সম্মুখে এক বিন্দু করুণা লাভের আশায় হস্ত প্রসারিত করিয়া সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্য করুণ নেত্রে তাহাদের প্রতি তাকায়, তখন তাহারা ইহাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। এই সব দরিদ্র, সর্বহারা ও মজলুম মানুষকে তাহারা হীন, নীচ ও মানবতার কুলাংগার বলিয়া মনে করে। অন্য কথায়, দরিদ্র আর সর্বহারা হইয়া যেন তাহারা মস্তবড় অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। এই ধরনের লোক যখন কোন কারখানার মালিক হইয়া বসে, তখন মজুর-শ্রমিকদিগকে তাহাদের শোষণ ও নিষ্পেষণের অগ্নিজ্বালায় ভস্ম করিতে

থাকে। আবার ইহারা যখন জমিদার ও জোতদার হইয়া বসে, তখন প্রজা-কৃষকগণ তাহাদের নিকট নিরন্তর লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হইতে থাকে। আর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব যখন ইহারা লাভ করে, তখন নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া দেশের কোটি কোটি বাসিন্দা খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া যায় এবং তাহাদের বঞ্চিত রেখে বিপুল জাতীয় সম্পদকে ইহারা নিজেদের বিলাস-ব্যাসন, লোভ ও লালসা এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অগ্নি শিখায় আহুতি দেয়।

## অস্বাভাবিক মালিকানা নীতির পরিণাম

বস্তুত ব্যক্তিগত মালিকানার এই অস্বাভাবিক নীতির এটাই মারাত্মক পরিণতি। এই নীতি আজ দুনিয়ার সকল পুঁজিবাদী দেশে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। কারণ মানুষ যখন নিজেকে কোন জিনিসের নিরংকুশ, প্রকৃত একক মালিক এবং সর্বময় স্বত্বাধিকারী বলিয়া মনে করিতে থাকে, তখন তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্বভাবগত মূর্খতা তাহাকে কৃপণ, লোভী ও অর্থগৃধ্নু করিয়া তোলে। বর্তমান দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ধর্মহীন গণতন্ত্রে ইহার বাস্তব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র একনায়কত্ববাদ আর সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার বুকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র অপেক্ষাও মারাত্মক ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, রাজা বা সম্রাট নিজেকে তাহার বিশাল রাজ্য বা সাম্রাজ্যের এবং সমগ্র উপায়-উপাদানের একমাত্র ও প্রকৃত মালিক বলিয়া মনে করিয়াছে। ফলে দেশে যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদানকে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কাজে ব্যয় করিয়াছে। আর কোটি কোটি জনগণের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং কল্যাণসাধনকে সে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে যারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করে, তাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তত্ব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজস্ব নয়, বরং দেশের জনগণই প্রকৃত কর্তৃত্বের মালিক— তাহাদের নিকট এই কর্তৃত্ব আমানত স্বরূপ অর্পণ করা হইয়াছে মাত্র। এই মনোভাবের কারণই গণতন্ত্রের অধীন মানুষ রাজতন্ত্র একনায়কত্ববাদ বা সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা অধিকতর শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু জনগণের রষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হওয়ার ধারণাটাও মূলত ভুল এবং অচিরে তাও মারাত্মক আকার ধারণ করিয়া বসে। রাজতন্ত্র একনায়কত্ববাগদ ও সাম্রাজ্যবাদ এক ব্যক্তির মধ্যে যে সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ঠিক তা-ই জাগিয়ে তোলে সমগ্র জাতির মধ্যে এবং ইহার পরিণাম অন্তহীন যুদ্ধ ও সংঘাত ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

মোট কথা, ইহা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তিগত মালিকানা— অন্যকথায় ব্যক্তির স্ব-উপার্জিত ধন-সম্পত্তির উপর তাহার নিরংকুশ মালিক হওয়া এক ভয়ানক মারাত্মক ব্যবস্থা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে এহেন বুনিয়াদী ধারণাই বর্তমান ধন-তন্ত্র, পুঁজিপতির ও জমিদারীর মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করিবার মূলীভূত কারণ।

## সম্পত্তির জাতীয়করণ

ব্যক্তিগত মালিকানার পরে দ্বিতীয় মত হচ্ছে জাতীয় মালিকানা। ইহার অর্থ এই যে, দেশের কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন দিক দিয়াই কোন জিনিসের মালিক হইবে না; বরং দেশের ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পত্তির মালিক হইবে নির্বিশেষে ও সম্মিলিতভাবে দেশের সমগ্র জাতি। সাধারণভাবে কমিউনিজম ও মার্কসবাদের ধ্বজাধারিগণই এ মত পোষণ ও প্রচার করিয়া থাকে। এই মতের দৃষ্টিতে সমাজক্ষেত্রে বক্তির স্বতন্ত্র সত্তার কোনই গুরুত্ব নাই, সকল গুরুত্ব এবং সর্বময় কর্তৃত্ব একান্তভাবে সমাজের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ব্যক্তি সেখানে খাটে, মেহনত করিয়া উপার্জন করো, কিন্তু উপার্জিত সম্পদের মালিক সে হইতে পারে না, সমাজ তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া নিজেই একচ্ছত্র মালিক হইয়া বসে। ব্যক্তি তাহার মেহনত, যোগ্যতা ও মননশক্তি ব্যয় করিয়া তাহার বিনিময়ে সমাজের নিকট হইতে পেটভরা খাবার, পরিধানের বস্ত্র আর সম্ভব হইলে বাসস্থান লাভ করে। ফলত সে সমাজের চাকর, এই চাকরী হইতে সে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও মুক্তি পাইতে পারে না। উপরন্তু তাহার এই নিরংকুশ ও একচ্ছত্র মনিব ও প্রভু তাহাকে এতটুকু সুযোগ দেয় না যে, সে নিজের দাবি অনুযায়ী নিজের পরিশ্রমের সঠিক মূল্য আদায় করিতে চেষ্টা করিবে।

ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি শ্রমিক মজুর নিজের শ্রম-মেহনত বিক্রয় করিয়া পুঁজিদারের নিকট উপযুক্ত মূল্য সে অনায়াসেই দাবি করিতে পারে, সে সুযোগ তাহাতে পূর্ণরূপেই লাভ করা যায়। এমন কি একজন পুঁজিদার তাহার দাবি অনুসারে মূল্য দিতে প্রস্তুত না হইলে সে অন্যত্র তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজ তথা এই জাতীয় মালিকানা ব্যবস্থায় সমাজ মজুর শ্রেণীর শ্রম-মেহনতের মূল্য যা-ইচ্ছা তা-ই নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে, সে সম্পর্কে মজুরের কোন কিছু বলিবার অধিকার মাত্রই নাই। এবং সমাজ কর্তৃক কোন মূল্যমান নির্দিষ্ট হইয়া গেলে তাহার প্রতিবাদ করিবার বা তাহার বিরুদ্ধে একক কিংবা সংঘবদ্ধ আওয়াজ বুলন্দ করিবার কোন সুযোগই সে পাইতে পারে না। এমন কি এই অত্যাচারী ও শোষক মনিবের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অন্য কোথায়ও ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখতেও সে সক্ষম হয় না। কেননা এখানে সে জন্মগত মজুর, সমাজ

তাহার স্বাভাবিক প্রভু। পরিশ্রমের মূল্য সে যা ইচ্ছা বাঁধিয়া দিতে পারে, কিংবা একেবারে না দিবার সিদ্ধান্ত করিলেও তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়—মজুর তাহার গোলামী হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

সমাজবাদে যত গালভরা দাবিই করা হউক না কেন, ব্যক্তির রক্ত পানি করিয়া উপার্জন করা সম্পদকে তাহার নিকট হইতে তাহার মর্জির বিরুদ্ধে কাড়িয়া লওয়ার সমাজের কি অধিকার থাকিতে পারে, সমাজবাদের এই ধ্বজাধারিগণ তাহার কোন যুক্তিই আজও পর্যন্ত উপস্থাপিত করিতে পারে নাই। শ্রমিক-মজুর বা কৃষকের শ্রম-লব্ধ সম্পদ ভোগ করিবার অধিকার যদি পুঁজিদার বা জমিদারের না থাকে তবে সেই মজুরের হাড়ভাংগা পরিশ্রমের ফল হরণ করিবার অধিকার সমাজ কি করিয়া লাভ করিতে পারে ?

সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে এই দুইটি মত সাধারণভাবে বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত আছে। ব্যক্তি মালিকানা অধিকার যদি অবাঞ্ছিত ও শোষণমূলক হয়, তবে সমাজের নিরংকুশ মালিকানাও ঠিক তদ্রূপ অস্বাভাবিক, অত্যাচারমূলক এবং মানবতা-বিরোধী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। উল্লিখিত মতদ্বয়ের প্রথমটি শোষণ পীড়নের চরম ব্যবস্থা আর দ্বিতীয়টি বর্বরতা ও জুলুমের শেষ সীমা। এক্ষণে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা যদি বাতিল ও ধ্বংসাত্মক হয় আর জাতীয় মালিকানার ধারণাও যদি অস্বাভাবিক জালিম ও মানবতা বিরোধী হয়, তাহা হইলে মানুষের উপায় কি? পৃথিবীর এই বিপুল ধন-সম্পদ ও মানুষের পরিশ্রম-লব্ধ এই অপর্যাপ্ত ধন ঐশ্বর্যের মালিক কাকে স্বীকার করিতে হইবে, আর কাকে এ সবের মালিক বলিয়া সমর্থন করিলে এই দুনিয়া ও গোটা মানুষ সর্বপ্রকার জুলুম, শোষণ, নিষ্পেষণ ও বর্বরতার অবাঞ্ছিত পরিণতি হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ?

## মালিকানা স্বত্ব ও ইসলাম

ইসলাম এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছে এবং সে জওয়াব অতীব সুষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত। ইসলাম বলে, পুঁজি বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ব্যক্তিও নয় সমাজও নয়। ইহার কারণ এই যে, পুঁজি বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সে-ই হইতে পারে, যে তাহা নিজ শক্তির বলে সৃষ্টি করিয়াছে অথবা উৎপাদন করিয়াছে সেই সব শক্তি যোগ্যতা ও সামর্থের যাহা পুঁজি সৃষ্টি করিয়াছে। আর ইহা সর্বজনবিদিত যে, কোন মানুষই দুনিয়ার কোন বস্তু বা শক্তি বা যোগ্যতার সৃষ্টি করে নাই— না কোন ব্যক্তি তাহা সৃষ্টি করিয়াছে আর না কোন মানবগোষ্ঠি বা কোন সমাজ। অতীব সুস্পষ্ট কথা— ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবশ্যক করে না। এই বিশাল দুনিয়ায় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তি বা সমাজের উর্ধ্বের কোন সত্তা যাহাকে

আমাদের জড়চক্ষু যদিও দেখতে পায় না—কিন্তু মন তাঁহাকে অনুভব করে। মানব-বুদ্ধি তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদেরকে বাধ্য করে। কারণ সৃষ্টিকর্তা যখন ব্যক্তিও নয়, সমাজও নয়, তখন একজন সাধারণ মানুষও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এই মানুষ ও জড়ের অতীত কোন সত্তা। ইসলাম এই সত্তার নাম রাখিয়াছে আল্লাহ্। ইসলামের দৃষ্টিতে এই আল্লাহ তা'আলাই সকল বস্তু এবং জীব ও জন্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন সকল শক্তি ও যোগ্যতা— কাজেই তিনিই সকল বস্তু এবং জন্তু, সকল সম্পদ এবং সম্পত্তি তথা সকল ব্যক্তি এবং সমাজের সৃষ্টিকর্তা ও একচ্ছত্র মালিক। মানুষের হাতে ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তাহা কোন ব্যক্তি বা সমাজেরই উপার্জিত হউক না কেন, তাহার সব কিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তিনি দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের জন্য মানুষের নিকট এইসব আমানত স্বরূপ রাখিয়াছেন মাত্র, তাহাও আবার অনন্ত কালের জন্য নয়; বরং একটি সুনির্দিষ্ট কালের জন্য মাত্র। এই আমানত রাখার মূলে আল্লাহ্র আর একটি বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা হচ্ছে মানুষের পরীক্ষা। আল্লাহ ত্র'আলা এই সম্পদ এবং সম্পত্তি মানুষের ভো- ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন আর সেই সঙ্গে দিয়াছেন সেই সব ভোগ-ব্যবহার করিবার— তথা ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজ-মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের জন্য একটি পূর্ণ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। আল্লাহ তা'আলা ইহার সাহায্যে মানুষকে এই দিক দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে, মানুষ কি এইগুলি নিজের ইচ্ছামত ভোগ ব্যবহার করে, না আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী করে। আর এইগুলিকে আল্লাহ্র দেওয়া বিধান মুতাবিক কোটি কোটি মানুষের মধ্যে বণ্টন করে, না তিল তিল করিয়া সঞ্চিত ও নিজস্ব ভোগের সামগ্রী করিয়া রাখে। সম্পদ সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের এ-ই গোড়ার কথা।

এই খানেই সমগ্র ব্যাপারটি শেষ হইয়া যায় নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলা পরিস্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুসারে যার নিকট যত পরিমাণ সম্পদ বা সম্পত্তি থাকুক না কেন তাহাকে যে সুষ্ঠুভাবে আল্লাহ্র বিধান মতো ব্যয় করিবে, তাহাকে তিল তিল করিয়া জমা করিয়া রাখবে না— এহেন পরীক্ষায় সেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। আর যে এরূপ করিবে না তাহার জীবন এই পরীক্ষায় ব্যর্থ প্রমাণিত হইবে। মালিকানা সম্পর্কে এই নীতি উপস্থাপিত করিয়া ইসলাম মানবীয় মালিকানার মূলে চিরতরে কুঠারাঘাতে করিয়াছে। এবং ব্যক্তি মালিকানা আর জাতীয় মালিকানা এই উভয় প্রকার ধ্বংসাত্মক মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক নূতন মত— আল্লাহ্র মালিকানা— পেশ করিয়াছে। এ দৃষ্টিতে মানুষ ধন-সম্পত্তির মালিক নহে, আমানতদার মাত্র। এই মতের ভিত্তিতে ইসলাম তাহার পরিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার

কাঠামো রচনা করিয়াছে। এহেন সমাজ ও অর্থব্যবস্থা যে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য, এবং তা যে মানবতার সকল দুঃখ-দারিদ্র, শোষণ-নিষ্পেষণ এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননার একমাত্র প্রতিষেধক তাহার প্রমাণ বিশ্ব-ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়ে তাহার বাস্তব পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেই অধ্যায়ের বিশিষ্টতা, সৌন্দর্য এবং সার্বজনীন কল্যাণকারিতা স্মরণ করিয়া আজও মানুষ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনমিত করে।

বর্তমান দুনিয়া যে অস্বাভাবিক, অসমান ও ভুল-ত্রুটিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার তলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে এবং অসংখ্য ও বিরাট সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া দুনিয়াকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সমাধান এবং নিখুঁত কল্যাণ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একমাত্র এই আল্লাহ্‌র মালিকানার ভিত্তিতে গড়া ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায়ই সম্ভব হইতে পারে। মানবীয় মালিকানার ব্যবস্থা— তাহা ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই হউক, কিংবা সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্রই হউক— উভয় ব্যবস্থাই অবৈজ্ঞানিক, ধ্বংসকারী এবং মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহা কোনদিনই নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না।

## পুজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে মজুরদের অবস্থা

বর্তমান পৃথিবী যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন, মজুর-শ্রমিকদের মজুরি সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। মেহনতী জনতার সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ মজুরি ও পারিশ্রমিক কি হইতে পারে— যাহাতে একদিকে শ্রমিকগণ নিশ্চিন্ত ও সচ্ছল জীবন যাপন করিতে পারে আর সেই সঙ্গে সামাজিক মান-মর্যাদাও তাহারা যথাযথভাবে পাইতে পারে— বর্তমানে এই প্রশ্নই মানুষের মনকে অত্যন্ত তীব্রভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

মজুরি সমস্যা চিরকালই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিলেও শিল্প-বিপ্লবের পরই এই সমস্যা আইন ও নৈতিকতা উভয় দিক দিয়াই দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে অত্যন্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। যন্ত্রের সাধারণ প্রচলন হওয়ার পূর্বে এক একটি কাজ যেখানে এক হাজার মজুর সম্পন্ন করিত ও তাহা হইতে নিজেদের জীবিকা অর্জন করিত— যন্ত্র আবিষ্কৃত ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে শুরু হওয়ার পর উহা একটি মাত্র যন্ত্র ও কয়েকজন মানুষের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে লাগিল, ফলে ব্যাপকভাবে দেখা দিল বেকার সমস্যা।

১. ১৯৫১ সালে ১২ই মে দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার 'সাহিত্য মজলিসে' প্রকাশিত।

আর প্রত্যেক দেশে যেহেতু মেহনতী জনতার সংখ্যাই সর্বাধিক ও বিপুল হইয়া থাকে, এই জন্য এই সমস্যার জটিলতা কেবল মজুরদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হইয় থাকে না; বরং শেষ পর্যন্ত তাহা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হয়। ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থার পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুনিয়ার আড়াইশত কোটি জনতার মধ্যে একশত কোটিই শ্রমজীবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে আরতৎকালনি পূর্ব পাকিস্তানে ইহার সংখ্য হচ্ছে সাত লক্ষ।

বর্তমান বিশ্ব সমাজের যতগুলো আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোন একটিও এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে নাই। যে সব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও সেই সঙ্গে অবাধ অর্থ শোষণের অবারিত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান সেইখানে মজুর-শ্রমিকগণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে নিষ্পেষিত হইতেছে। আর যেখানে মজুর-শ্রমিকদের ওপর রাষ্ট্র-সরকারের নিরংকুশ প্রাধান্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে সেখানে তাহারা বাধ্যতামূলক দাসশ্রম ও সীমাবদ্ধ মজুরীর অভিশাপে জর্জরিত হইতেছে। পার্থক্য এই যে, পুঁজিবাদী দেশে মজুর-শ্রমিকগণ মজুরী সম্পর্কে দর কষাকষি করিতে পারে, দাবি-দাওয়া পেশ করিতে, দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে, ধর্মঘটের হুমুকী দিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের সাহায্যে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিয়া নিজেদের দাবি অনুযায়ী মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারে। কিন্তু যেখানে মজুরদের ওপর একমাত্র সরকারের নিরংকুশ কর্তৃত্ব কায়েম হইয়া আছে সেখানে মজুর-শ্রমিকগণ নিজেদের কোন অভাব-অভিযোগ, মজুরী সম্পর্কে আপত্তি কিংবা অতিরিক্ত কোন দাবি পেশ করিতে পারা তো দূরের কথা, এ সম্পর্কে মনে মনেও অসন্তোষ পোষণ করিতে পারে না। অন্যথায় নিষ্পেষণ ও শুদ্ধির আঘাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া অবধারিত। কিন্তু উভয় প্রকারের সমাজেই যে ব্যাপকভাবে শ্রমিক অসন্তোষ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কোনমতেই তাহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইতেছে না, তা সর্বজনবিদিত।

বিগত ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্যন্ত আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ভারতে যেসব ধর্মঘট সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহা হইতে বর্তমান ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯৫৪ সনের নভেম্বর মাসে বৃটেনের ডক শ্রমিকগণ যে ধর্মঘট করিয়াছিল তাহা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই ধর্মঘট শেষ হওয়ার পূর্বে ২০ হাজার ডক শ্রমিকের সঙ্গে ৭০ হাজার রেল শ্রমিকও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ইহার ফলে বৃটিশ সরকারকে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় ও কয়েক মাস পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

আমেরিকায়ও অনুরূপ ধর্মঘটের কোন সীমা সংখ্যা নাই। ১৯৫৫ সনের মার্কিন দূতাবাস হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকায় ১৪ বৎসর কিংবা তদূর্ধ বয়সের বেকারদের সংখ্যা হচ্ছে ২৮,৩২,২০৬। আর তাহারা যে মজুর-শ্রমিক ছাড়া অন্য কোন লোক নয় তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। ভারতের অবস্থা আরও মারাত্মক। সেখানে সম্ভবত একটি মাস এমন যায় না যখন সেখানে কোন-না-কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট বা দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় না। ১৯৫৫ সনে কানপুরে সমস্ত বস্ত্রমিলের মজুরগণ Rationalisaton-এর বিরুদ্ধে কয়েক মাস পর্যন্ত ধর্মঘট করিয়াছিল, যার ফলে ভারতের বস্ত্র-শিল্প কয়েক কোটি টাকার লোকসান স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই বিরাট লোকসান দেখিয়া তথাকার সরকার সম্পূর্ণ নীরব ও নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। অর্থাৎ মজুর-শ্রমিকদের দুরাবস্থা দূরীকরণ এবং তাহা দূর করিবার জন্য মজুরদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ভারত সরকার কোনই দায়িত্ব বোধ করে নাই। বরং অসহায় ও অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মজুর-শ্রমিকদেরকে মুষ্টিমে পুঁজিপতির বজ্র মুষ্ঠিতে সোপর্দ করিয়া দিয়া জাতীয় সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভূমিকা অবলম্বন করে। একটি ধর্মহীন পুজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মজুরদের যে কি দুরাবস্থা হয় এবং এই ধরনের রাষ্ট্র মজুরদের পক্ষে যে কতখানি অসহযোগী তা ভারত সরকারের নিষ্ক্রীয় ভূমিকা ও ভারতের মজুরদের অবস্থা হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়।

১৯৬৪ সনে অক্টোবর-নবেম্বর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে চটকল সমূহে যে ব্যাপক ও একটানা দেড় মাসাধিকালের ধর্মঘট চলে এবং এ ব্যাপারে তৎকালী সরকার যে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করে, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের যে সব দেশের মজুরদের রাজত্ব কায়েম রয়েছে, রাষ্ট্রের নির্মম ও নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণের দরুন সে সব দেশের মজুরদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিছু জানিতে পারি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসকদের অনুবীক্ষণ হইতে বাঁচিয়া যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় কিংবা বৈদেশিক পর্যটকদের মারফতে বহির্বিশ্ব যাহা কিছু জানিতে পারে তাহা হইতে এতটুকু অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন নয় যে, এই সব মজুর-রাষ্ট্রে শ্রমিক মজুরদের অবস্থা পুজিবাদী দেশ বিশেষত ঃ আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মজুরদের অপেক্ষা কিছুমাত্র উন্নত নহে। মেহনতী জনতাকে শ্রান্ত ও দমন করিবার জন্য সেখানে কর্মীদেরকে নির্মম হস্তে ধোলাই করা হয়, অপরদিকে কঠোর বাধ্যতামূলক শ্রম ও সীমাবদ্ধ মজুরির নিপীড়নে তাহাদিগকে জর্জরিত হইয়া থাকিতে হয়।

যেসব দেশে বাক-স্বাধীনতা হরিয়াছে এবং যেসব দেশের সরকার বার্ষিক রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে সব দেশের মজুর-শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যেখানে কেবল মুখ ও লেখনীর উপরই নহে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা শক্তির উপর পর্যন্ত কঠোর পাহারা বসানো হইয়াছে, সেখানকার মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তবুও যতটুকু বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে তা-ই এখানে পেশ করা যাইতেছে।

রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস-এর পাক্ষিক মুখপত্র 'সোভিয়েত দেশ' সোভিয়েট রাশিয়ায় কি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শীর্ষক প্রবন্ধে মজুরদের অবস্থা লিখিতে গিয়া বলা হইয়াছে ঃ তাহাদের বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করিবার ব্যাপারে এখানো পুরোপুরি সাম্য কায়েম করা হয় নাই। কেননা তাহারা সমাজ হইতে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নহে; বরং শ্রম মেহনত অনুযায়ী অংশ পাইয়া থাকে। ইহা শ্রমিকদের প্রয়োজন পূরণের ব্যর্থতা সম্পর্কে এমন একটি রাষ্ট্রের স্পষ্ট স্বীকৃতি যা বিগত ৩৮ বৎসর পর্যন্ত দুনিয়ার অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দিয়া আসিতেছে।

মজুরগণ তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কবে ও কোন দিন উৎপাদনের অংশ পাবে, কিংবা আদৌ কোনদিনই পাবে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা মুশকিল। কিন্তু 'পরিশ্রম' অনুযায়ী তাহারা কত এবং কিভাবে মজুরি পাইয়া থাকে এবং তাহাদের শ্রমের সঠিক মূল্য নির্ধারণ কারা করিয়া থাকে, তাহা অবশ্যই আলোচিত হইবে। উপরন্তু সরকারী সাধারণ কর্মচারী ও মজুর-শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতের প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা মিসেস সূচেতা কৃপালনী ১৯৫৪ সনের মধ্যভাগে রাশিয়া সফরান্তে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন ঃ

শ্রমিকদের সঠিক মজুরি কত, তাহা জানিতে পারা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। যখনি আমরা বিশেষ কোন শিল্পক্ষেত্রে সেখানকার মজুরদের উচ্চ ও নিম্ন বেতনের পরিমাণ জানিতে চাহিয়াছি তখনি আমাদিগকে মাঝামাঝি পরিমাণই বলা হইয়াছে। তাহার পরও খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর জানা গেল যে, নিম্নতম মজুরি হইতেছে পাঁচশত রুবল, অথচ কারখানার ডাইরেক্টর পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার রুবল পর্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। অর্ধ সপ্তাহিক 'দাওয়াত'— ২৫ জুলাই ১৯৫৪।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পরই এই নিম্নতম মজুরি জানিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়ত ঃ ইহাও অসম্ভব নয় যে, ইহা সেই

কারখানার অবস্থাও হইতে পারে, যাহা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোত্তম ও যা বিদেশী পর্যটকদের দেখাইবার জন্য ও বহির্বিশ্বে সুনাম অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

তদুপরি পাক-ভারতের লোকদের নিকট পাঁচ শত রুবল খুব বিরাট কিছু মনে হইবে এবং তাহারা মনে করিবে যে, সেখানকার নিম্ন বেতানভোগী সাধারণ মজুরদেরও জীবন মান বুঝি কতই না উন্নত! কিন্তু রাশিয়ার দ্রব্যমূল্যের উচ্চতা ও বেতনের মধ্যে যে ৫০—১ পার্থক্য রয়েছে সেই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে পাঁচ শত রুবলের কোন ধোকাই টিকিয়া থাকিবে না। মজুরি কম কিংবা বেশি তাহা নির্ধারণের জন্য দ্রব্যমূল্যই হইতেছে সঠিক মাপকাঠি। এই জন্য এইখানে তাহার একটি চার্ট দেওয়া যাইতেছে।

১৯৫৪ সনের আগস্ট মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য জ্ঞানী গৌরমুখ সিংহ রাশিয়া সফর করিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে তাহার কিছুটা উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

“রাশিয়ার সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দেখিলে পাঁচশত রুবল মজুরির রহস্য বুঝিতে পারা যায়। মনে রাখা দরকার যে, একটি রুবলের মূল্য আমাদের দেশী টাকা অনুসারে ১'০৯ টাকা মাত্র; কিন্তু সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্যব্যাদীর মূল্য নিম্নরূপ ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| একটি ডিমের | মূল্য | ৩ | রুবল |
| একটি মোরগের | মূল্য | ২৫ | রুবল |
| টামটোর প্রতি কেজি | মূল্য | ২ | রুবল |
| দুগ্ধ প্রতি কেজি | মূল্য | ২০ | রুবল |
| আলুর প্রতি সের | মূল্য | ৬ | রুবল |
| মূলার প্রতি কেজি | মূল্য | ৫ | রুবল |
| গাজর প্রতি কেজি | মূল্য | ৮ | রুবল |
| শালগমের প্রতি কেজি | মূল্য | ৭ | রুবল |
| ডবল রুটির প্রত্যেকটির | মূল্য | ২ | রুবল |
| বকরীর গোশত প্রতি সের | মূল্য | ১৮ | রুবল |
| ৬ সিট কাগজের | মূল্য | ৪ | রুবল |
| একটি শীতল কোর্তার | মূল্য | ২০০ | রুবল |
| গমের এক মণ | মূল্য | ৮৫ | রুবল |
| মেয়েদের ছোট ব্যাগ প্রতিটি | | ৯০ | রুবল |

এইখানে শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিসের মূল্যের উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানে একজন মজুর পাঁচশত রুবল বেতন পাইলেও তাহার জীবন যাত্রা মোটেই সচ্ছল হইতে পারে না। আর কেবল রাশিয়ায়ই নহে, প্রতিটি কমিউনিস্ট দেশেরই এই অবস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক ইশতেহার হইতে এই সব দেশের শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাহাতে স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে যে, "চেকোস্লোভাকিয়ার মজদুর আইন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের (I.L.O) মূলনীতির পরিপন্থী।—মজদুরদের দ্বারা ক্রীতদাসদের ন্যায় কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত ভয়ানক পদ্ধতি। রাশিয়ার আইনে রাজনৈতিক সন্দেহসূত্রে শ্রমিকদিগকে বাধ্যতামূলক দাস শ্রমিকদের ক্যাম্পে বন্দী করিয়া রাখার সুযোগ রহিয়াছে।

অতঃপর চীনের মজুর শ্রমিদের অবস্থা সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কেননা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কমিউনিস্ট প্রচারক আজকাল কথায় কথায় চীন দেশের দোহাই দিয়া থাকে।

১৯৫৩ সনে এপ্রিল মাসে 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ডেলিগেশন'-এর সদস্য হিসাবে ব্রজকিশোর শাস্ত্র সরকারী আমন্ত্রণক্রমে চীন গমন করে। সেখানে তিনি মজুর-শ্রমিকদের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করিয়া তিনি সেখানকার মজুর-শ্রমিকদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ ঃ

> "এখানে আমরা হালের সঙ্গে বলদের পরিবর্তে মেয়েলোককে বাঁধা দেখিয়াছি। সে কত মর্মান্তিক ও অমানুষিক দৃশ্য। মেয়েলোক—তাহাকে হালের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে"।

চীনের ইংয়াংস্টেরি ভারপ্রোজেক্ট-এ সব মজুর শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"এই প্রোজেক্ট-এর নিকটে অফিসারদের থাকিবার বাংলা নির্মাণ করা হইয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর এখানে কাজ করে। সকল প্রকার পাথর ভাঙ্গা হইতে শুরু করিয়া সুড়ঙ্গ খোদাই করা কিংবা পাথরে চটান স্থানান্তরিত করা। প্রভৃতি যাবতীয় কাজই অনাবৃত হাতে করা হইয়াছে। মজুরগণ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করিতেছিল, তাহা ছিল খুবই দুর্বল ও প্রায় অকেজো এবং নিকৃষ্ট ধরণের। মনে হইতেছিল যে, তাহা কোন যাদুঘর হইতে আনা হইয়াছে।

তিনি বলেন, "আমি এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্তের জন্য হতচেতন হইয়া পড়িলাম। চীন দেশের মেহনতী লোকদের দ্বারা যেভাবে কাজ করানো হইতেছে তাহা দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা যা তাহা হইতে কোন প্রকার প্রেরণা লাভ

তো দূরের কথা; বরং বড়ই দুঃখ ও বেদনা পাইলাম। আমি ভীত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মানুষ আর যাহাই হউক জন্তু নয়। কোন দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জন্তুদের স্থানে মানুষকে ব্যবহার করা মানবতার উপর নির্মম জুলুম ও চরম অমানুষিকতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

ইহার প্রতিবাদ করারও ভাষা নাই। মজুরদের বেশির ভাগ বহু দূর-দুরাঞ্চল হইতে আনা হইয়াছে। বর্তমান চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার তাহাদের কোন পথ নাই। মূলত চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রেসিডেন্ট মাও সেতুং এখানে বাধ্যতামূলক অমানুষিক শ্রমের রাশিয়া-পরীক্ষিত 'কার্যপদ্ধতি' প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শাস্ত্রী মহাদয়ের এই বিবরণের পর চীনা মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য উল্লেখযোগ্য এই যে, এইরূপ বাধ্যতামূলক অমানুষিক পরিশ্রমের পর তাহারা মজুরী বাবদ যাহা কিছু পায় তাহা পাক-ভারতের সরকারী অফিস ও কারখানার মজুরদের বেতন অপেক্ষা অনেক কম।

একজন চীনা শ্রমিক এক হাজার পনেরো শত 'ইয়ান' কিংবা পঞ্চাশ ইউনিট পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। (এক 'ইয়ান' তৎকালীন পাকিস্তানের) এক পয়সার একটু বেশি ও এক ইউনিট আট আনা কিংবা তাহার একটু বেশির সমান' আর পঞ্চাশ ইউনিটে আমাদের ২৫/২৬ টাকার সমান হয়।) এই সামান্য ও সংক্ষিপ্ত পারিশ্রমিক নিয়ে একজন শ্রমিক যখন বাজারে যায় তখন চেতনা হরণকারী দ্রব্যমূল্যের সম্মুখীন হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহোদয় বলেন ঃ

> "নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ভারত অপেক্ষা চীনদেশে অনেক বেশি। চাউল, কাপড়, তৈল, লবনের মূল্য ভারত অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নিজিসের মূল্য সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন।"

প্রত্যক্ষদর্শীর এই বর্ণনার ভিত্তিতে অনায়াসেই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, বৃটেন ফ্রান্স আর স্বয়ং আমাদের দেশে অন্ততঃ সরকারী মজুর ও কারখানার কুশলীরাও কি এই অপেক্ষা অনেক বেশি বেতন বা মজুরি পায় না ? আর চীন অপেক্ষা এই সব দেশের দ্রব্যমূল্যও কি অনেক কম নয় ? এতৎসত্ত্বেও আজ এদেশের এক শ্রেণীর কমিউনিষ্ট চীন ও রাশিয়াকে 'স্বর্গরাজ্য' বলিয়া মনে করে এবং অবুঝ যুবক-যুবতীদেরকে অনুরূপ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নানারূপ মিথ্যা প্রচারনার সাহায্যে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সঠিক জ্ঞানের আলোকে এই সব অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকার যতশীঘ্র দূর হইয়া যায় মানবতার পক্ষে ততই মংগল— তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

সাপ্তাহিক 'জাহানেও নও' পত্রিকার শ্রমিক উন্নয়ন সংখ্যায় প্রকাশিত।

# ইসলামে মজুরদের অধিকার

বর্তমান দুনিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এবং জমিদারী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা মারাত্মকরূপ ধারণ করিয়াছে। একদিকে আজ পুঁজিদার কারখানা মালিকদের হাতে মজুর-শ্রমিকগণ, অপরদিকে বড় বড় জমিদার সামন্তদের কবলে গরীব কৃষকগণ নির্মমভাবে শোষিত ও নিষ্পেতি হইতে। অভাব ও দারিদ্র, অনশন ও অর্ধাশনের উপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাহাদের স্বাস্থ্যের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছে। শ্রেণী বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ তাহাদের নৈতিক ও মানসিক শক্তিকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে।

কৃষক-মজুরদের এই চরম দুরবস্থাকে একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। তাহারা মার্কস-লেনিনের প্রেতাত্মা স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভের গুপ্তচর হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমগ্র পৃথিবীকে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার লৌহ-নিগড়ে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে। বর্তমান দুঃখী ও বঞ্চিত মানবতাকে চীন রাশিয়ার সুখী (?) সমাজের উন্নত (?) জীবনধারার বিচিত্র কাহিনী শুনাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের কারখানা আর জমির মালিকদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। “তোমাদের সকল প্রকার দুঃখ এবং দুর্গতির অবসান (?) ঘটাইতে পারে একমাত্র কমিউনিজম এবং কমিউনিস্ট সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন আদর্শই তোমাদের দুরবস্থা দূর করিতে পারে না’—প্রচ্ছন্ন অপ্রচ্ছন্ন সকল প্রকার কমিউনিস্টদের মুখে এই প্রচারণা বনাম প্ররোচনা খুব জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশেও চীন ও রাশিয়ার অসংখ্য গুপ্তচর বিভিন্ন বেশে কাজ করিয়া যাইতেছে। চাষী মজুরদের প্রতি সহনুভূতি প্রদর্শন করিয়া অন্ন বস্ত্রের আওয়াজ তুলিয়া আন্দোলন আর সংঠনের কাজ অবিশ্রান্তভাবে—আর কতকটা অবাধে—চালাইয়া যাতেছে।

অপরদিকে কমিউনিজমের এই প্রচারণার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে যেসব উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহা এতই হাস্যকর যে, সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকিলেই ইহার বাতুলতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কমিউনিজম আর কমিউনিস্টদের দোষ-ক্রুটি, অন্যায়-অনাচার নির্যাতন আর অসচ্ছরিত্রের কথা বর্ণনা করা, প্রচার করা আর বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়াই উহার সয়লাব-স্রোত রোধ করিবার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সেইজন্য দরকার বর্তমান সমাজের এই অশান্ত ও অসম অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা, এক উন্নততর সুষ্ট অর্থ ব্যবস্থার সাহায্যে মজুর-শ্রমিক— তথা কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক

দুর্গতির চির অবসান ঘটান। বস্তুত কমিউনিজমের সয়লাব স্রোতের এ-ই একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা, অন্য কিছু নয়। ভুল আদর্শই হউক আর বিজ্ঞানসম্মত সত্য আদর্শই হউক, কেবল ফাঁকা বুলি দ্বারা কমিউনিজমের গতিরোধ করা বা উহার প্রচার বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত বর্তমান সমাজে এই মৌলিক ত্রুটিগুলি এবং সামাজিক শোষণ-পীড়ণ ও অবিচারের ভিত্তিমূল চূর্ণ করা না হইবে, যতদিন এই অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করিয়া এক সুস্থ, সুন্দর, সুসমৃদ্ধ, সুসমঞ্জস সমাজের সৃষ্টি করা না যাইবে, ততদিন কমিউনিজমের সংক্রামক ব্যাধি কিছুতেই দূর করা যাইবে না।

কাজেই আজ বিশেষভাবে কমিউনিজমের মৌলিক দোষত্রুটি এবং ভিত্তিগত ধ্বংসকারিতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মজুর-কৃষক তথা গোটা সমাজের সম্মুখে অপর একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পেশ করিতে হইবে। এই কাজ শুধু মুখে করিলেই চলিবেনা, বাস্তব কর্মাদর্শ ও কার্যকর প্রোগ্রাম লইয়াই এই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের অর্থব্যবস্থা— যাহা সর্বপ্রকার সৌন্দর্য ও সার্বজনীনতাপূর্ণ এবং ইহকাল ও পরকালের সকল রকম কল্যাণ ব্যবস্থার মূল উৎস হইতে পারে, তাহা ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান প্রবন্ধে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মজুর-শ্রমিক আর কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। এই আলোচনার সুযোগে আমি এদেশের জমি-মালিক, পুঁজিদার ও কারখানা মালিকদিগকে অবিলম্বে ইসলাম নির্দিষ্ট অধিকার সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিব। কারণ, তাহাতেই সকল শ্রেণীর মানুষ—তথা গোটা দেশের কল্যাণ একান্তভাবে নিহিত রহিয়াছে; আর তাই সকল প্রকার অমঙ্গল ও ভাঙ্গন-বিপর্যয়ের নির্মম আঘাত হইতে গোটা সমাজকে রক্ষা করিতে পারে।

সর্ব প্রথম একথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়া লওয়া দরকার যে, মজুরি খাটা অর্থাৎ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরের কাজ করা, অন্য কথায় শ্রমের মূল্য আদায় করা বা গ্রহণ করা— ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র হীন বা ঘৃনার্হ কিংবা বর্জনীয় নয়। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ। —কোন্ প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্রতর।" উত্তরে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সৎ ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা।"

পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিবার প্রতি উৎসাহদান করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন ঃ اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ। —হালাল উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্ধু।"

অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ

উপার্জনের কোন পেশা গ্রহণকারী বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّانِعَ الْحَاذِقَ -

চতুর ও দক্ষ শিল্পীকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।

সদুপায় অর্থ উপার্জনের প্রতি মানুষকে পথনির্দেশ করিবার কাজ তিনি কেবল মুখেমুখেই বলিয়াই সমাধা করেয়ন নাই। তিনি নিজে কার্যত পরিশ্রম করিয়া উপার্জনও করিয়াছেন, অন্যের মূলধনে নিজের শ্রম যোগ করিয়া ব্যবসা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) কুপ হইতে পানি তুলিয়া খেজুরের বাগান সিক্ত করিয়াছেন এবং এই পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি কিছু পরিমাণ খেজুর মুজুরী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে যাহারাই একনিষ্টভাবে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহারা নিজের শ্রম ও মজুরির সাহায্যে উপার্জন করিয়া দুনিয়ার সম্মুখে সুস্পষ্ট নিদর্শন সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইমামগণ, প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ পর্যন্ত মজুরি ও সাধারণ পেশার কাজ করিয়া রোজগার করিয়াছেন। এই সম্মানিত ব্যক্তিদের আদর্শ ও জীবন-কাহিনী দুনিয়ার ইতিহাসে উজ্জল অক্ষরে লিখা থাকিবে।

হযরত উমর ফারুক (রা) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন শ্রম-মেহনত করিয়া অর্থোপার্জনের কাজ বন্ধ করিয়া না দেয় এবং এই বলিয়া যেন বেকার হইয়া বসিয়া না থাকে যে, 'হে খোদা তুমি আমাকে খাবার দাও'। কারণ তোমরা ভাল করিয়া জান যে, আকাশ হইতে সোনা চান্দি ঝরিয়া পড়ে না।"

এক কথায় জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন পেশা অবলম্বন করা, সৎ চাকরী বা মজুরি খাটিয়া জীবন যাপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত অন্যায় বা নিন্দনীয় নয় এবং উপার্জনের সঙ্গত কোন উপায় অবলম্বন করিবার দরুন কাহারো মনে কোনরূপ হীনতাবোধ জাগ্রত হওয়াও উচিৎ নয়। মজুর নিজে নিজেকে কখনো ছোট ও নীচ মনে করিবে না, আর কারখানার মালিককেও কোনদিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিবে না। পক্ষান্তরে কারখানা মালিক নিজেও নিজেকে মজুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং মজুরকে নিজ অপেক্ষা হীনতর বলিয়া মনে করিবে না। বস্তুত পণ্যোৎপাদনের ব্যাপারে শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় অপরিহার্য। কারণ তাহা ব্যতীত পণ্যোৎপাদন মাত্রই সম্ভব নয়। তাই এই উদ্দেশ্যে পুঁজিদার ও শ্রমিকের সমন্বয় সাধন একান্ত আবশ্যক। অতএব পরস্পর পরস্পরকে পাণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সহকারী ও সহযোগী বলিয়া মনে করিবে।

## ইসলামী সমাজে মজুরদের মর্যাদা ও অধিকার

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে মজুর ও চাকরদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট আলোক সম্পাৎ করা হইয়াছে। হযরত নবী করীম (স) হযরত আবূ বকর (রা) কে সম্বোধন করিয়া একদা মজুর দাসদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেনঃ

هُمْ اَخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ - فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ يُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ - (بخاری شریف)

যাহারা তোমাদের কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন করে সেই মজুর ও দাস তোমাদের ভাই— আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যাহার কাছে এইরূপ লোক রহিয়াছে, তাহাকে যেন সে তাহাই খাইতে দেয় যাহা সে নিজে আহার করে; আর তাহাকে যেন তাহাই পরিতে দেয়, যাহা সে নিজে পরিধান করে। তাহার সাধ্যশক্তির অতীত কোন কাজের চাপ যেন তাহাকে না দেয়। দিলে সে কাজ সমাধা করিবার ব্যাপারে যেন তাহাকে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে।

আমাদের কারখানার মালিকগণ যদি খাঁটি খাঁটি মুসলিম হইয়া বিশ্বনবীর এই আদেশ অনুসারে কাজ করিতে শুরু করিয়া, পক্ষান্তরে মজুর কৃষকগণ যদি মার্কস-লেনিনের ফাঁকা বুলির মোহ ত্যাগ করে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার আদায় করিবার জন্য সঠিক ইসলামী পন্থায় আন্দোলন করিয়া, তাহা হইলে শ্রেণী-বিদ্বেষ ও শ্রেণী-সংগ্রাম এবং অমানুষিকভাবে স্বার্থের টানা-হেঁচড়া শোষণ ও পীড়ন নিমেষে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং রক্তপাত ও বিদ্রোহ বিপ্লব ব্যতিরেকেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। উল্লিখিত হাদীস হইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রমাণিত হয়। পণ্যোৎপাদনের ব্যাপারে মজুর ও মূলধনীদের জন্য ইহা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বিশেষ ঃ

১. মজুর ও পুঁজিদার যে কাজ করে এবং মজুরদের দ্বারা যে কাজ করায়— ইহারা উভয়ই ভাই বলিয়া মনে করিবে। দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ইহাদের মধ্যেও ঠিক তাহাই হইবে। বিশ্বনবীর ইহাই আন্তরিক বাসনা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে ইহাই সুষ্ঠু মানবিক আদর্শ।

এই ব্যাপারে মূলনীতি হিসাবে যদি এইটুকু কথাই বলা হইত এবং সকলে মিলিয়া এই অনুসারে কাজ করিত তাহা হইলেও সকল প্রকার সমস্যার উৎসমুখ বন্ধ হইতে পারিত। কারখানা মালিক কারখানা শ্রমিককে যদি নিজের ভাই বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে আর কোন সমস্যাই থাকিতে পারে না। শ্রমিক

ও মজুরের যাবতীয় দুঃখকষ্ট দূর করা এবং সর্বোতভাবে তাহার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই তখন কারখানা মালিকের কর্তব্য হইবে। কিন্তু বিশ্বনবীর এই কথা এই অস্পষ্টতার মধ্যে শেষ হইয়া যায় নাই, তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

২. অন্তত খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করা পর্যন্ত মজুর ও মালিকদের আর্থিক অবস্থা একেবারে সমান-স্তরের হইতে হইবে। মালিক নিজে যা খাইবে, তাহাই মজুর ও শ্রমিককে খাইতে দিবে, যাহা নিজে পরিধান করিবে মজুরকেও তাহাই পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কেবল গার্হস্থ্য পর্যায়ের শ্রমিক-মজুর সম্পর্কেই নির্দেশ নহে; বরং আধুনিক উন্নত শিল্প-কারখানা পর্যায়ের শ্রমিক মজুরদের সম্পর্কেও ইসলামের ইহা বিধান। এই আদেশ হইতে মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিও নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যায়। হযরতের এই আদেশকে মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া কোনক্রমেই ঠিক হইবে না; বরং ইসলামী হুকুমত আইনের সাহায্যে এইরূপ আচরণকে প্রত্যেক মালিক ও মূলধনীর পক্ষে অবশ্য করণীয় ও বাধ্যতামূলক করিয়া দিবে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ -

মজুর–শ্রমিক ও ভৃত্যদের যথারীতি খাদ্য ও পোষাক দিতে হইবে।

উল্লিখিত হাদীস হইতে হযরতের নির্দেশ ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামী হুকুমতের অধীন প্রত্যেক মজুর ও শ্রমিককে মালিকের সমান স্তরের খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ করিবার পরিমাণ অনুপাতে পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে হইবে। বর্তমান সময় মজুরির হার যদি এতটুকু পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় এবং মালিক ও মূলধনী মালিকদের মানের খাওয়া-পরা-থাকা ইত্যাদি শ্রমিক ও শ্রমিকের সন্তানরাও লাভ করিতে থাকে, তাহা হইলে তথায় শোষণ বলিতে কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা, থাকিতে পারেনা কোন শ্রেণী বিদ্বেষ। শ্রেণী-বৈষম্যের তৈল খনিতে আগুন লাগাইয়া মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করাও কাহারো পক্ষে সম্ভব হয় না।

৩. সময় ও কাজের কঠোরতা—উভয় দিক দিয়াই মজুরকে সক্ষম ও সমর্থ করিয়া রাখিতে হইবে। এমন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত রাখা বা এমন কোন কাজের বোঝা মজুরের মাথায় চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না, যাহা করিতে সে একেবারেই অসমর্থ কিংবা যাহা করিলে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে বা তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ঃ

وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ -

মজুরদের সাধ্যের অতীত কোন কাজ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে না।

বিশ্বনবীর এই ছোট কথাটি মজুর-শ্রমিকের জন্য চিরন্তন রক্ষাকবচ। বর্তমান যুগে মজুরদের কাজের সময়ের পরিমাণ এবং কাজের স্বরূপ নির্ধারণ—শ্রমিকদের এই দুইটি প্রধান ও বুনিয়াদী সমস্যার সমাধান এই ছোট্ট বাণীটির ভিত্তিতেই অতি সুন্দরভাবে করা যাইতে পারে। সহজ কথায় বলিতে গেলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাজের গুরুত্ব অনুপাতে সাধরণভাবে যে কয় ঘন্টা শ্রম করা সম্ভব ঠিক তত ঘন্টাই মজুরদের নিকট হইতে কাজ লওয়া যাইবে এবং ততটুকু সময়ের কাজের বিনিময়ে তাহাকে পূর্ণ একটি দিনের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ করিবার সমান মজুরি দিতে হইবে।

৪. এমন কোন কঠিন কাজ যদি এসে পড়ে যা সমাধা করা মজুরের পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য, যথা—কারখানার বর্তমান মজুর সংখ্যা সেই কাজ সম্পন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কিংবা সে কাজ সমাধার জন্য যথেষ্ট শারীরিক শক্তি মজুরের নাই, এমতাবস্থায় সে কাজটি অসম্পূর্ণ রাখা হইবে এবং সামগ্রিক প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এইভাবে বন্ধ করে দিয়া কারখানা অচল করে দেওয়া হইবে— তাহা মোটেই সমীচীন নহে। পক্ষান্তরে মজুরদের শক্তি থাকুক আর না-ই থাকুক তাহাদের দ্বারা সে কাজ অবশ্যই জোর করিয়া করান হইবে বা তা করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে— ইহাও হইতে পারেনা। এহেন অবস্থায় ইসলামের নির্দেশ এই যে, বর্তমান মজুরদিগকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, সেই কাজ সমাধার জন্য যথেষ্ট জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শক্তি অথবা সময়-সুযোগের শক্তি দিয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। হাদীসে উল্লিখিত فَاَعِيْنُوْهُمْ শব্দটির অর্থ এই নয় যে, এহেন অবস্থায় মালিক বা মূলধন নিজেই মজুরদের সঙ্গে কাজে নামিয়া পড়িবে। কারণ তা সব সময় সম্ভব ও সহজ হয় না এবং একজন বা দুইজনের শারীরিক সাহায্য সেই কাজ সমাধার জন্য যথেষ্ট না-ও হইতে পারে। আর তাহার প্রয়োজনও কিছু নেই। বরং বর্তমান মজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিলেই যথেষ্ট হয়। মজুরদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার একাধিক উপায় হইতে পারে; আর তাহা প্রয়োজন অনুপাতেই করিতে হইবে। প্রয়োজন হাইলে মজুরদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতে হইবে, তাহাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা রক্ষার জন্য বিশ্রাম গ্রহণের অবসর দিতে হইবে। সেই জন্য আবশ্যক হইলে মজুরির হারও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এক কথায় উপস্থিত কাজ সম্পন্ন করিতে যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেমন দেশ ও জাতির প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বন্ধ বা ব্যাহত না হয়, কারখানা-মালিকের কাজেরও যেন সমাধা হয়, মজুরদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজেরও যেন চাপ না পড়ে। ইসলামে শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ইহাই প্রধানতম মূলনীতি।

বর্তমান যুগে কারখানা-মালিক ও মজুর-শ্রমিক এবং পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের যে আকাশ ছোঁয়া তুফান জাগিয়া উঠিয়াছে, এই হাদীসের ভিত্তিতে তাহার সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অবসান সাধন করা অতীব সহজ।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ইহা মোটেই মন ভোলানো প্রস্তাব কিংবা 'খেয়ালী স্বর্গ' বিশেষ নয়। ইহা একটি বাস্তব কর্মাদর্শ। ইহার ভিত্তিতে মানবেতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ে সমাজের যাবতীয় আর্থিক সমস্যার সমাধান করা হইয়াছিল, বাস্তবক্ষেত্রে তদনুযায়ী কাজ করিয়া একটি যুগের মানুষের জীবনকে সুখ-শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলা হইয়াছিল। ফলে তৎকালে শ্রম-মুজুরি এবং শ্রমিক মূলধনীদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য, শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন হযরত আবুযার গিফারী (রা)। তিনি বলিয়াছেন, তিনি হযরতের মুখে এই পবিত্র বাণীটি ঠিক সেই সময় শুনিয়াছেন, যখন তিনি ও তাঁহার ভৃত্য ঠিক একইরূপ পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি এই হাদীসটি ইরশাদ করেন। হযরত আবুযার (রা) একদা তাঁহার ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, হযরত নবী করীম (স) তা শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এখনও কি জাহিলী যুগের বদ-অভ্যাস বর্তমান আছে ? অর্থাৎ ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করা জাহিলী স্বভাব-বিশেষ, ইসলাম তা বরদাশত করেনা। অতঃপর প্রতিটি ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করাই হযরত আবুযারের আজীবনের কার্যসূচীতে পরিণত হইয়াছিল। হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর বায়তুল মাকদাস সফরকালে উষ্ট্র চালনার কাজে ভৃত্যের সাথে আধাআধি ভাগ করিয়া লওয়ার ঘটনা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। তিনি মদীনার চতুর্দিকে রাত নিশিথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং যেখানে কোন মজুর-দাসকে কোন কঠিন কাজে নিযুক্ত দেখিতে পাইতেন তাহাকে তাহা হইতে মুক্তি দিতেন এবং কাহাকেও তাহার ন্যায়সংগত মজুরি কম পাইতে দেখিলে তাহার মজুরি বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজন পরিমাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। (عمدة القرى نشرح البارى ج ١٣-١٠٨، ١)

শ্রমিক-মজুরদের প্রতি বর্তমান যুগের পুঁজিদার ও কারখানা-মালিকদের আচরণ শোষণ ও উৎপীড়নমূলক সন্দেহ নাই। তাহারা মজুর-শ্রমিককে খাটাইয়া নির্দিষ্ট কাজ তিল তিল করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া লয়, অথচ শ্রমিকদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ মজুরি আদৌ দেয় না। আর দিলেও নানা কৌশলে ও ফাঁদ-প্রতারণায় জড়াইয়া উহার অধিকাংশ কাটিয়া-ছাটিয়া রাখিয়া দেয়। তাহার পরও যে সামান্য পরিমাণ বেতন বা মজুরি প্রাপ্য হয় তাহাও যথাসময় আদায় করিতে কুণ্ঠিত হয় এবং অফিসের নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইনের প্রতিবন্ধকতার অজুহাতে ওয়াদার পর ওয়াদা করিয়া অভাব-পীড়নে তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হয়। একদিকে গরীব ও মজুরদের শিশু-সন্তান ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, দুঃসহ জ্বালায়, শীত-গ্রীষ্মের, রোগ-দুঃখের দুঃসহ চাপে জর্জরিত হইয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ।

অপরদিকে আকাশচুম্বি বিরাট প্রাসাদের উপর তলায় বিদ্যুত-পাখার হিমশীতল মলয়-হিল্লোল মজুর-দেহের শোণিত বর্ণের লাল-পানি পানের রুদ্রদর্পিত হুঙ্কার—'এখন দিতে পারব না।' এক সপ্তাহ পরে বেতন পাইবে' ইত্যাদি।

পুঁজিদার আর মালিকদের এবম্বিধ আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায়-অনাচারমূলক এবং ইহা মজুরদের প্রতি তাহাদের অমানুষিক জুলুম, সন্দেহ নাই। ইসলামের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মানবতার এই দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। দুঃখী মানবতার আহাজারী তাঁহার হৃদয়-মনকে বিষায়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যথিতের প্রতি সহানুভূতিই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত। তাই তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে ইরশাদ করিয়াছিলেন ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِيْهِ اَجْرَهٗ (مشكوه)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কঠিন অভিযোগ উপস্থিত করিব— যে ব্যক্তি আমার জন্য কাহাকেও কিছু দান করিবার ওয়াদা করিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিল, কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যে উহার মূল্য গ্রহণ করিল এবং যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কাজে নিযুক্ত করিয়া পুরাপুরি কাজ আদায় করিয়া লইল, কিন্তু তাহার মজুরি দিল না— ইহারাই সেই তিন জন।

অন্য একটি হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ "ধনীর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পরের 'হক' আদায় করিতে অকারণ বিলম্ব করা জুলুম"।

নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় আদেশ করিয়াছেন ঃ

اُعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ رِيْقُهٗ -

মজুরকে তাহার ঘাম শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই মজুরি শোধ করে দাও।

অর্থাৎ মজুরি শোধ করিতে অকারণ কিছুমাত্র বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এই ব্যাপারে কোনরূপ টাল-বাহানা করা এবং কোনরূপ ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া পরিস্কার জুলুম এবং সকল প্রকার জুলুম শোষণের উৎস চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়াই ইসলামী হুকুমতের কর্তব্য। এই জন্য রাষ্ট্র যথাযোগ্য আইন রচনা করিয়া পুঁজিদার ও কারখানা মালিককে নির্দিষ্ট সময়ে এবং পুরাপুরিভাবে শ্রমিকের বেতন আদায় করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। বর্তমান কালের শ্রমিক-মজুরদের জীবনে দুঃখ-দারিদ্রের যে অমানিশা নামিয়াছে, ইসলামী হুকুমতে তাহার চির অবসান হইবে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَـهٰى عَنِ الْاِسْتَـجَـارَةِ الْاَجِـيْـرِ حَـتّٰى يُبَـيِّـنُ لَـهُ اَجْـرُهُ (بيهقى)

মজুরের বেতন নির্দিষ্ট না করে তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে হযরত নবী করীম (স) পরিস্কার ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন।

এযুগের পুঁজিদার ও কারখানা-মালিকগণ গরীব দুস্থ ও দারিদ্র নিপীড়িত মজুরদের প্রতি যে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক আচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে শোষণ করিবার জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে, মজুরি নির্ধারিত না করিয়া তাহাদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করিয়া এবং কাজ আদায় করিবার পর সামান্য কিছু দিয়ে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেয়— বর্তমান বিপর্যস্ত সমাজে এই ধরনের দুর্নীতি এবং জুলুম-পীড়নের কোনই অন্ত নাই। কিন্তু ইসলামী সমাজে ইহার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিতে পারিবে না। সেখানে মজুরির পরিমাণ অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট রাখিয়া কাজ করা কিংবা করান মাত্রই জায়েয নয় বরং কাজ— কাজের স্বরূপ এবং উহার মজুরি— পূর্বেই সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মজুরি নির্ধারিত না করিয়া কাজ করিলে সেই ধরনের কাজে যাহা মজুরি সাধারণত দেওয়া হয়, তাহাই আদায় করিতে হইবে। মালিক নিজের ইচ্ছামত মজুরির কোন পরিমাণ নির্ধারিত করিতে পারিবে না— করিলে মজুর বা শ্রমিক তা কবুল করিতে বাধ্য হইবে না। কাজের স্বরূপ অনুসারে মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে ইসলামী হুকুমত সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে এবং এক সুসমঞ্জস্য ও সুবিচারপূর্ণ হার নির্দিষ্ট করি দেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাহার রহিয়াছে।

শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া শিল্পপতি ও পুঁজিদারগণ তাহাদের উপর যাতে কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে এবং কোনরূপ শোষণ পীড়ন করিতে না পারে, ইসলামী রাষ্ট্র তাহার নিখুঁত ব্যবস্থা করিবে।

ইসলামী শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মজুরের অধিকার সম্পর্কে একটি হাদীস সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে। হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিছেন ঃ

اُعْـطُوا الْعَـامِلَ مِنْ عَـمَـلِهِ فَـاِنَّ عَـامِلَ اللّٰهَ لَايُـخَـبْ (رواه احمد)

মজুরকে তাহার কাজ হইতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহ্‌র মজুরকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।

এই হাদীসের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মজুরের নির্ধারিত বেতন বা মজুরি আদায়ের পরও মূল কারখানায় যাহা মুনাফা হইবে তাহা হইতেও মজুরকে অংশ দিতে হইবে। এই সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতিতে যদিও সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও নিম্নলিখিত হাদীসটি এই ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকসম্পাৎ করে। হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ مِنْهُ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ - (مشكوة)

তোমার ভৃত্য যদি তোমার অন্ন প্রস্তুত করে এবং তাহা লইয়া তোমার নিকট আসে,— যাহা রান্না করিবার সময় আগুনের তাপ এবং ধুম্র তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে— তখন তাহাকে তোমার সাথে বসাইয়া খাওয়াইবে। খানা যদি শুষ্ক রান্না হইয়া থাকে, তবে তাহা হইতে তাহার হাতে এক মুঠি বা দুই মুঠি অবশ্যই তুলিয়া দিবে।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক নিজের শ্রমের সাহায্যে মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটাইয়া যাহা উৎপন্ন করিবে, তাহা হইতে তাহাকে নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়ার পরও আসল মুনাফা হইতে তাহাকে কিছু না কিছু অংশ দিতে হইবে। হাদীসে উল্লিখিত ঘরের বাবুর্চি আর কারখানার শ্রমিকের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। একজন বাবুর্চিকে খাদ্য পাকাইবার কাজে যেভাবে মনোযোগ দিতে হয়, দেহ ও চিন্তা শক্তিকে যেভাবে নির্দিষ্ট এক কাজের জন্য নিয়োজিত করিতে হয়, কম-বেশি প্রায় তদ্রূপই কারখানার একজন মজুরকেও খাটিতে হয়। কাজেই এই হাদীস অনুসারে নির্বিশেষে সকল শ্রমিকই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য হইতে অংশ পাইতে পারিবে। যে মিলে কাপড় তৈরী হয়, প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার পরিবারবর্গের জন্য বৎসরে এক বা একাদিকবার কাপড় দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নির্দিষ্ট বেতনের মধ্যে গণ্য হইবে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কোন মিলে শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া থানকে থান কাপড় বুনে অথচ তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের লোকদের পরিধানে হয়ত ছিন্নবস্ত্রটুকুরও অস্তিত্ব নাই। এই হাদীস অনুসারে ইসলামী সমাজে যে শ্রমনীতি কায়েম করা হইবে তাহাতে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকিতে পারিবে না। খাদ্য প্রস্তুতকারী পাচকের অভুক্ত থাকা যে ইসলাম বরদাশত করিতে পারে না, কারণ খাদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে মালিক শুধু দ্রব্যসামগ্রী দিয়াই রেহাই পাইয়া যায়, কিন্তু উহা প্রস্তুত করিতে গিয়া আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়ার জ্বালা পাচককেই ভুগিতে হয়। তাহা হইলে যে কারখানায় মজুর শ্রমিকগণ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া হাজার হাজার থান কাপড় বুনল, সে বা তাহার পরিবারবর্গ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকিবে, আর ওদিকে কারখানা-মালিক তাহার কুকুরকে পর্যন্ত মখমলের মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, এমন অবিচার ও অসাম্য ব্যবস্থা ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না। একথা প্রমাণ করিতে খুব বেশি যুক্তির আবশ্যক করে না।

ইসলামে মজুর-শ্রমিকদের এই সব অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়, যেসবের উপর ভিত্তি

করিয়া আধুনিক সমস্যা ও প্রয়োজন অনুপাতে এই সম্পর্কীয় একটি পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত বিধান রচনা করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আমাদের বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, বর্তমান সময় মজুর-শ্রমিকদের এই আকাশ ছোঁয়া জটিল সমস্যা সমূহের সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান করিতে পারে একমাত্র ইসলাম। মালিক-মজুরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম অতি সহজেই বন্ধ হইতে পারে? তিক্ততার পরিবর্তে তথায় মধুর সহযোগিতা ও সহানুভূতিমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হইতে পারে।

অতএব অনতিবিলম্বে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা এবং ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মালিক ও মজুরের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা একান্তই কর্তব্য। আর সেই জন্য সরকার ও কারখানা মালিকগণের তথা সমগ্র দেশবাসীরই প্রাণপণ চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।[১]

## শ্রমিক আন্দোলন

ইসলামের শ্রমিক-মজুরদের জন্য যে সব অধিকার নির্ধারিত হইয়াছে, তদৃষ্টে এইকথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইসলামী সমাজে মজুরদের কোন প্রকৃত সমস্যাই অসমাপ্ত থাকিয়া যাইতে পারে না। শুধু সমাধান তাহাই নয়, শ্রমিক-মজুরদের যাবতীয় মৌলিক সমস্যান সুষ্ঠু সমাধান কেবলমাত্র ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজেই সম্ভব।

ইসলামী আদর্শ মজুর-শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যার যেভাবে সমাধান করে, তাহা কোন বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র জিনিস নহে। এমন জিনিস নহে যে, উহার সাহায্যে নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র মজুরদের সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে। বরং তাহা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ, পূর্ণমাত্রায় গঠিত ইসলামী সমাজেই— যেখানে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে, কেবলমাত্র সেখানেই— এই সমস্যার সমাধান পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করা সম্ভব। ইললামী আদর্শে গঠিত নয় এমন সমাজে মজুর সমস্যার ইসলামী সমাধান কার্যকর হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এই কারণে যাহারাই ইসলামী আদর্শে মজুর সমস্যার সমাধান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সোজা-সুজি ও কেবলমাত্র মজুর সমস্যার সমাধানের জন্য নহে; বরং ইসলামী আদর্শে এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগী হইতে হইবে। ইসলামী আদর্শ বিরোধী সমাজে মজুরদের সমস্যার ইসলামী সমাধান লাভ করিতে চাওয়া মরুভূমির বুকে ঝর্ণা প্রবাহের কামনা করিবার সমতুল্য।

১. প্রবন্ধটি ১৯৫১ সালের ৫ই জুলাই ঈদ সংখ্যা দৈনিক 'আজাদে' প্রকাশিত হয়।

## শ্রমিক ও সমাজ

বস্তুত মজুর-শ্রমিক একটি গোটা সমাজের অঙ্গ বিধায় সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের যাহা আদর্শ মজুর সমস্যার সমাধানেরও সেই আদর্শই কার্যকরী হইতে পারে। আর সমাজ যদি পুঁজিবাদী হয়, মজুর শ্রমিকরাও পুঁজিবাদী আদর্শেই নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধান পাইতে পারে; আর সমাজ যেখানে সমাজতন্ত্রী, মজুর শ্রমিকগণও সেখানে গোটা সমাজের ন্যায় সামগ্রিকতাবাদের (Totalitarianism) শৃংখলে বন্দী হইয়া থাকিতে বাধ্য। অনুরূপভাবে মজুর-শ্রমিকদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা কেবলমাত্র ইসলামী সমাজেই বাস্তবায়িত হইতে পারে। কাজেই শ্রমিক-মজুরদের সমস্যার ইসলামী সামাধানকে কার্যকরী করিবার জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গোটা সমাজকে গঠন করাই প্রাথমকি কাজ। সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে একবিন্দু ধারণাও যাহাদের আছে, তাহারা এই কথার যথার্থতা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মজুর সমস্যার ইসলামী সমাধান কার্যকরী করা সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বা নিরবতা ও ঔদাসিন্যতা অবলম্বন করিতে পারেনা। পক্ষান্তরে মজুর সমস্যার ইসলামী সমাধান কার্যকরী করণের জন্য যে আন্দোলন তাও মূলগতভাবে ইসলামী সমাজ গঠনের আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে না। মজুর-শ্রমিকদের সমস্যাবলীর ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাধান করিবার জন্য যে আন্দোলন তাহাকে মৌলিক নীতি প্রকৃতির দিক দিয়া অবশ্যই ইসলামী আন্দোলন হইতে হইবে এবং গোটা ইসলামী আন্দোলনকে ও শ্রমিক-মজুরদের সমস্যাবলীকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাধান করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

## বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন

বাংলাদেশ যদিও ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে যাইতেছে এবং এখানে পূর্ণমাত্রায় ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য প্রবল ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু এখানে মজুর সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্য যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক নহে এবং তাহা ইসলামের নির্ধারিত পথে পরিচালিত হইতেছে বলিয়াও দাবি করা চলে না। ইহার কারণ প্রধানত এই যে, বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন বৃটিশ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনেরই উত্তরাধিকারী মাত্র।

পাক-ভারতের শ্রমিক আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত বিভাগ পর্যন্ত ইহা এক নিজস্ব ও নির্ধারিত রূপ পরিগ্রহ করে। ভারত বিভাগের পর অতি

স্বাভাবিকভাবেই মজুর আন্দোলনও বিভক্ত হইয়া এদেশে অনুপ্রবেশ করে। পূর্বে এই আন্দোলন যে ধরনের নেতৃত্বে এবং যে ধারা-প্রকৃতিতে পরিচালিত হইত এদেশে ও ঠিক অনুরূপ নেতৃত্বে ও ধারা-প্রকৃতিতে পরিচালিত হইতে শুরু করে। তাই বলা যায়, বিভাগ পূর্ব মজুর আন্দোলন ও বিভাগোত্তর শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রীতি-নীতি ও ধারা-প্রকৃতির দিক দিয়া কোনোই পার্থক্য নাই। আর এই কারণেই এদেশে জনগণের আদর্শিক ভিত্তির সহিত এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের কোন সামঞ্জস্য বা ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব এইখানে ইসলামী ধারা-প্রকৃতির অনুরূপ এক শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা একান্তই আবশ্যক।

দেশের বর্তমান শ্রমিক-নেতৃত্ব বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং এখানকার সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত না হওয়ার কারণে এদেশের জনগণের আদর্শিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের ধারা-প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত করিবার প্রয়োজন বোধ করা হয় নাই। পূর্বে এ আন্দোলন যেমন চলিত সম্পূর্ণ সেকিউলারিস্ট ধারায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং উহার পরিণামে সৃষ্টি হইত মালিক ও শ্রমিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ; ঠিক তেমনি বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনেও এই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু এখানকার নেতৃত্বে মজুরদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বার্থোদ্ধারের ব্যাপারেও পূর্ণ নিষ্ঠাবান বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে নাই। এদেশে এইরূপ নেতৃত্ব বিরল নহে, যাহারা মজুর-শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘট করিতে বাধ্য নিজেদের মালিক পক্ষের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই মালিকদের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রচার করে। ফলে মজুরদের স্বার্থ বিনষ্ট হয়, আর মাঝখান দিয়া তাহাদের নেতৃত্ব বিপুল অর্থ লুটিয়া লয়। মজুরদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ, লবি অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লয়। এইরূপ মজুর-নেতা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক বিরাজ করিতেছে বলিয়া মজুরদের কোন সমস্যারই একবিন্দু সমাধান লাভ আজও সম্ভব হইল না।

তাই এই কথায় কোনই সন্দেহ থাকেনা যে, দেশের বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন আদর্শিকতার দিক দিয়া যেমন এখানকার জনগণের চিন্তা-বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, তেমনই তাহা মজুর-শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ আদায়েরও অনুকূল নহে। মজুরদের বর্তমান নেতৃত্ব কোন দিনই প্রকৃত সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইবেনা, বরং উহাকে যথাযথভাবে জিয়াইয়ে রাখিতেই সযত্নে চেষ্টা চালাইতে থাকিবে। কেননা সমস্যার সমাধানই যদি হইয়া যায় তাহা হইলে শ্রমিক আন্দোলনেরও প্রয়োজন থাকিবে না, আর তাহাদের নেতৃত্বের আবশ্যকতাও ফুরাইয়া যাইবে।

## নবতর শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও ভিত্তি

এই সব কারণেই বাংলাদেশে এমন এক মজুর আন্দোলন গড়িয়া তোলা আবশ্যক যাহা একদিকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। অপর দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুর শ্রমিকদের উপস্থিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিবে—তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সহকারে আন্দোলন চালাইবে। এইরূপ এক পূর্ণাঙ্গ মজুর আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি ভিত্তি একান্তই জরুরী।

১. সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও পরিকল্পনা।

২. সমাজ-সংস্থার শ্রমজীবীদের সম্মানজনক স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টি ও সচেতনতা।

৩. শ্রম ও পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য।

৪. শিল্পগত সম্পর্ক ও সম্বন্ধের রীতিনীতি।

৫. শ্রমের কারণ ও উদ্বোধক।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধ হইতে একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে ইসলাম এক অত্যন্ত ব্যাপক এবং কল্যাণকর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করিয়াছে। ইসলামের একটি নিজস্ব সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে উহার এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও পরিকল্পনা রহিয়াছে। ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজের শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার কোন দিক দিয়াই হীন নহে, হেয় ও ঘৃণার্হ নহে। বরং হালাল রিযিক লাভের জন্য যে কোন প্রকারের শ্রম— দৈহিক কিংবা মানসিক— সবই ইবাদত এবং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়।

এই কারণে ইসলামী সমাজে শিল্পগত সম্পর্ক ঠিক মানবীয় ধারায় স্থাপিত হইতে বাধ্য। শ্রমজীবিরাও মানুষ, অতএব 'হক্কুল ইবাদ'-এর ইসলামী ধারণার ভিত্তিতেই মালিকদের হক-এর মুকাবিলায় শ্রমজীবীদের 'হক'-ও নির্ধারিত হইবে— ইহাতে সংঘর্ষের অবকাশ নেই বললেও চলে।

বর্তমান শ্রমিক অশান্তির কারণ অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত মনস্তাত্বিক। এই মনস্তাত্বিক কারণ যতদিন বর্তমান থাকিবে শ্রমিক অশান্তি প্রশমনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আধুনিক শিল্প-নীতিতে পুঁজির মুকাবিলায় শ্রমের মূল্য কম, মর্যাদা আরো হীন। ইহার দরুন শ্রমিক অশান্তি যে অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কমিউনিজম শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু উহা কিতাবের পৃষ্ঠা হইতে নামিয়া বাস্তবক্ষেত্রে যখনই কার্যকর হইতে শুরু করিয়াছে, তখনই

দুনিয়ার মানুষ দেখিতে পাইয়াছে যে, 'মজদুর-রাজ'-এর নামে সেখানে এক বিশেষ কর্তা-শ্রেণীর নিরংকুশ ও সর্বাত্মক ডিকটেটরী শাসন কায়েম হইয়া শ্রমিকদের আষ্টেপৃষ্ঠে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ তুষের আগুনের মতো জ্বলিয়া সমাজ সংস্থাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে।

## শ্রমের উদ্বোধক

ইসলামী সমাজে শ্রমের উদ্বোধক স্বার্থ, লোভ বা বিলাস উপকরণ সঞ্চয় প্রবণতা নয়; বরং তা হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য লাভ, আল্লাহ ও রাসূলের সন্তোষ বিধান এবং ইহকাল ও পরকালের সর্বোচ্চ কল্যাণের অধিকারী হওয়ার উদ্দীপনা।

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনে উপরোক্ত পঞ্চ ভিত্তিকে উপক্ষা করা হইয়াছে। ফলে এখানকার শ্রমিক আন্দোলন যেমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তেমনি ইহার নেতৃত্বও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। আন্দোলনের দুর্বলতা ও নেতৃত্বের ব্যর্থতার অন্য সব কারণের মধ্যে শিল্পপতি ও মালিক পক্ষের ভুল আচরণ ও সরকারী লেবার ডিপার্টমেন্টের মজুরধ্বংসী নীতিকে প্রধানত দায়ী করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মজুর নেতৃত্বের বন্ধ্যাত্ব যে অন্যতম কারণ তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা-সংকোচ করা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত পঞ্চ ভিত্তিকে স্থায়ী বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া শ্রমিক আন্দোলন গঠন করা না হইলে—না আন্দোলন জোরদার হইতে পারে আর না পারে উহার নেতৃত্ব কিছুমাত্র বলিষ্ঠ হইতে। এই কথা যতশীঘ্র স্বীকার করা হইবে শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থকতা ততই নিশ্চিত ও আসন্ন হইবে।

ইসলামী আদর্শে মজুর আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমত সাধারণভাবে সমগ্র শ্রমজীবি এবং বিশেষভাবে তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করিতে হইবে যে, দেশে সামগ্রিকভাবে ইসলামী সমাজ গঠনই হইতেছে তাহাদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সঠিক ব্যবস্থা। অতঃপর এই প্রেক্ষিতেই শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। বস্তুত সমগ্র দেশে যদি ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে সাধারণ লোকদের ন্যায় মজুর-শ্রমিকরাও মনস্তাত্বিক অশান্তি এবং নৈতিক ও অর্থনৈতিক দূর্নীতি ও শোষণ-অপমান হইতেও স্থায়ীভাবে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। এই কারণে শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ইহা হইতে হইবে।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে এক আদার্শিক শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করাও আবশ্যক। কেননা নিজস্ব শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা ব্যতীত কোন আদর্শ ভিত্তিক

আন্দোলনই সফল লাভ করিতে পারেনা। ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাহার সাহায্যে শ্রমজীবীরা ধীরে ধীরে ও অত্যন্ত কার্যকর ভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুকূলে এক জীবন্ত সার্থক শক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ টেকনিকও এই উদ্দেশ্যের অনুকূলে গ্রহণ করা হইবে।

এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর একটি বিশেষ অংশ হিস্যাবে সাধারণ মজুর-শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক চেতনা ও জ্ঞান এবং সেইজন্য এক উদগ্র পিপাসা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের এমনভাবে ট্রেনিং দিতে হইবে যেন তাহারা ইসলামী সমাজ গঠন ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ব্রতী ব্যক্তি বা দলের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

## স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে মজুরগণ যাহাতে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে, মজুর আন্দোলনকে সেইজন্য যত্নবান হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শ্রমিক আইন (Lebour laws)-এর পরিবর্তন ও সংশোধন সূচিত করা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময়ের পরিমাণ হ্রাস, সাধারণ জীবন যাপনের মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের শিশু সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করণ এবং সেই সঙ্গে মজুর সংগঠনের এবং সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা চালাতে হইবে। মজলুমের সাহায্য ও জুলুম প্রতিরোধের জন্য বীর দর্পে আগাইয়া আসিতে হইবে। সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রম-জীবী যাহাতে মানুষের মর্যাদ ও অধিকার পাইয়া জীবন যাপন করিতে পারে, সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মজুরদের ন্যায়সংগত অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তাহা বিদূরণ করা অপরিহার্য মনে করিতে হইবে। আর গোটা আন্দোলনকে এমন প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিতে ও চালাইতে হইবে যে, উহাতে যাবতীয় দাবি দাওয়াকে সংঘর্ষের পরিবর্তে একই সমাজের দুইটি শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির পর্যায়ে রাখিয়া সকল দাবি-দাওয়া আদায় ও সকল সমস্যার সমাধানের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পথ উন্মুক্ত হইবে।

এক্ষণেই এইরূপ এক নবতর আদর্শবাদী শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করা যাইতেছে। বর্তমান শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ শ্রমজীবিগণের আশু দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

**সমাপ্ত**